ডেজার্ট সাফারী

কাজী জহিরুল ইসলাম

এক পশলা মরুর লু হাওয়া এসে শরীরে ধাক্কা মারলো। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়েই জহুর সাহেবকে বললাম, চলেন ডেজার্ট সাফারি করে আসি। জহুর সাহেব অস্ট্রেলিয়া থেকে জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম-এর ওপর পিএইচডি করেছেন। অস্ট্রেলিয়াতেই সেটেল্ড। বর্তমানে আমার সহকর্মী, জাতিসংঘের আইভরিকোস্ট মিশনের জিআইএস অফিসার। অমায়িক মানুষ। বললেন, আপনি যা বলবেন তাতেই রাজী।

আমরা একটা ট্যাক্সি নিলাম। সোজা নাসের স্কয়ার, ল্যান্ডমার্ক হোটেল। হোটেলের লবিতে নাদুশ-নুদুশ এক রাশিয়ান যুবতী বসে আছে। ট্যুরিস্ট কম্পানির এজেন্ট। একটা গোলাপী হাসি দিয়ে মেয়েটি বললো, আপনারা কি নগর রাইড করবেন? আমরা বললাম, ডেজার্ট সাফারী করবো। ৯০ ডলার দিয়ে দু'জন দুটি টিকেট কিনে নিয়ে সোজা রুমে চলে গেলাম। তরুণী জানালো, বিকাল সাড়ে চারটায় একটি ঝকঝকে নতুন টয়োটা ল্যান্ড ক্রুইজার এসে হোটেলের গেইট থেকে আমাদের তুলে নেবে।

বাইরের তাপমাত্রা সাঁইত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এখন জুন মাস। প্রচন্ড তাপে পুড়ছে দুবাই শহর। মরুর লু হাওয়া বইছে শহরের ওপর দিয়ে। লু হাওয়ার প্রবাহটা শরীরে যেন আগুনের ছ্যাকা দিচ্ছে। ঝকমকে প্রাসাদোপম দালানের সারির ওপর কেমন যেন একটা ধুসর আবরণ। সমস্ত শহরে কি অতি সুক্ষ্ম কোন বালির মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে? পশ্চিম আফ্রিকায় এ রকম একটা বালির মেঘ দেখা যায় ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে। ওরা এটাকে বলে হারমাটান। পশ্চিম আফ্রিকায় ডিসেম্বর-জানুয়ারী হলো গ্রীস্মকাল, আর জুন-জুলাই হলো শীতকাল। হারমাটানের দিনে দরোজা-জানালা বন্ধ করে রাখলেও সাহারা-কালাহারি থেকে উড়ে আসা অতি সুক্ষ্ম ধুলার আবরণে ঢাকা পড়ে যায় ঘরের সব আসবাবপত্র, বই-খাতা, তৈজষপত্র। এই সময় আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন থাকে। আসলে ওটা পানির মেঘ না। ধুলার মেঘ। বেশ কয়েকদিন সূর্য দেখা যায় না। এ সময়ে নানান রকম অজানা অসুখ-বিসুখে ছেয়ে যায় দেশ।

ঝকঝকে ল্যান্ড ক্রুইজার আসে নি। এসেছে একটা মধ্যপুরোনো ল্যান্ড ক্রুইজার। ড্রাইভার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আমার নাম ওয়াকার। ওয়াকার ছিপছিপে এক পাকিস্তানী যুবক। গাড়িতে বসে আছে আরো দু'জন সাফারি রাইডার, এক ব্রিটিশ দম্পতি, জুডিথ আর বেন। জহুরুল সাহেব ওদের পাশে গিয়ে বসলেন, আমি বসলাম ড্রাইভারের পাশে, সামনের সীটে। দুবাই শহরকে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়েছে অ্যারাবিয়ান গালফ থেকে ছুটে আসা একটি ন্যাচারাল ক্রিক। আল-মাকতুম সেতু পেরিয়ে আমরা ক্রিকের অন্যপাড়ে চলে এলাম, বার-দুবাইয়ে। বিমানবন্দর, নাসের স্কয়ার হলো ডেয়রা-দুবাইয়ে। হাতের ডানদিকে জুমায়রা বিচের ওপর ভেসে থাকা পালতোকা নৌকার মতো দুলছে পৃথিবীর একমাত্র সেভেন স্টার হোটেল, বুর্জ-আল-আরব।

পথে আরেক জায়গায় গাড়ি থামালো ড্রাইভার। বাঙালী বাঙালী চেহারার এক কৃষ্ণকায় ভদ্রলোক উঠে এসে জীপের একদম পেছনের সীটে গিয়ে বসলেন। গাড়ি ছুটছে ধুসর মরুর বুক চিকে শারজার দিকে। আমি এবং জহুর সাহেব বাংলায় কথা বলছি। দুবাইয়ের ৪ ট্র্যাক রাস্তা, অত্যন্ত পরিকল্পিত রাইট টার্ন এক্সিট এবং গোছানো শহরের প্রশংসা করছি। উদ্দেশ্য পঞ্চম ব্যক্তিটি যদি দৈবাৎ বাঙালী হয়ে থাকে

তাহলে নিশ্চয়ই সাড়া দেবেন। কিন্তু ও পক্ষ থেকে কোনো সাড়া আসছে না দেখে এবং ভদ্রলোকের গায়ের রঙ দেখে আমরা মোটামুটি নিশ্চিত যে তিনি শ্রীলংকান।

একটা গ্রোসারী শপের সামনে গাড়ি থামালো ওয়াকার। আমাদেরকে বলা হলো, সবাই একটা করে ফ্রি ড্রিঙ্ক নিতে পারো। একে একে আরো নয়টি সাফারি জিপ এসে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালো এখানে। নানান দেশের প্রায় অর্ধশত পর্যটকের এক মিলন মেলায় পরিণত হলো গ্রোসারী শপটি। আমি একটি ট্যুরিস্ট টুপি কিনলাম। ওয়াকার ওর ল্যান্ড ক্রুইজারের চাকার হাওয়া কমিয়ে নিলো। মরু ড্রাইভে চাকার হাওয়া কমিয়ে নিতে হয়।

প্রায় ৮০/৯০ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে আমরা এখন এক গহীন মরুর বুকে। ২৫/৩০ ফুট উঁচু উঁচু বালুর পাহাড়। এখনি শুরু হবে দূর্ধর্ষ ডেজার্ট সাফারি। দলের বয়স্ক নারী-পুরুষেরা আগেই আত্মসমর্পন করে ফেলেছে। ওদেরকে জড়ো করে অন্য দুটো গাড়িতে তুলে দেওয়া হলো।

৪৫ মিনিটের ডেজার্ট ড্রাইভে অনেকেই বমি করে গাড়ি ভাসালেন। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিলো এই বুঝি গাড়ি উল্টে গেলো। টানটান উত্তেজনা গাড়ির ভেতরে। বাইরে দিগন্ত বিস্তৃত ধূসর মরু-পাহাড়। পড়ন্ত বিকেলের প্রলম্বিত সূর্যের লাল আভা। প্রতিটা গাড়িতেই ভয়ের শোরগোল।

ডেজার্ট রাইড শেষ। এখন আমরা একটা মরুপর্বতের চূড়ায়। সন্ধ্যা হয় হয়। পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। সবাই গাড়ি থেকে মেনে এসে ছবি তুলতে শুরু করেছে। মরুভূমির এ এক অদ্ভুত নিয়ম। যতই সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, তাপমাত্রা ততই পড়ে যাচ্ছে। এখনকার তাপমাত্রা খুবই আরামদায়ক। লু হাওয়াটাও ক্রমশ শীতল হয়ে আসছে। সবাই যখন দলে দলে নানান ভঙ্গিতে ছবি তুলছে তখন হঠাৎ আমি আবিস্কার করলাম, পূব আকাশে মস্ত বড় এক চাঁদ আর ঠিক তার উল্টোদিকে পশ্চিমাকাশে ডিমের কুসুমের মতো লাল সূর্য। দিগন্ত বিস্তৃত ধূসর মরুসুন্দরী যেন ওর দুই হাতে চাঁদ আর সূর্যকে নিয়ে একদল পর্যটকের সামনে সার্কাস দেখাবে বলে হাজির হয়েছে। এমন অসাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্য আমার জীবনে আর কোনো দিন দেখিনি। দুবাইয়ের গহীন মরুতে এসে আজ যেন জীবনের ষোলআনা অর্থ খুঁজে পেলাম।

এরপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো আরো গভীর মরুতে, ছন এবং কাঠের তৈরী এক ক্যাম্পে। একটা পাঁচ'শ মিটার সার্কেল। চারদিকে ঢাকার বইমেলার মতো খোলা স্টল। ওগুলোতে চমৎকার সব স্যুভেনির, পানীয় এবং খাবারের সমারোহ। মাঝখানটা খোলা। মাথার ওপর ঝকঝকে পরিস্কার আকাশ। অসংখ্য তারার বাতি। আর উটপাখির মস্তবড় এক ডিমের মতো ধবধবে চাঁদ। ক্যাম্পের আয়োজনের মধ্যে রয়েছে উটের পিঠে চড়া, বারবিকিউ করা, শিশা (বিশেষ আরবীয় হুক্কা) খাওয়া, আর সবচেয়ে আকর্ষণীয়, ট্রেডিশনাল অ্যারাবিয়ান বেলি নৃত্য। বারবিকিউ চলছে। দলের তরুণ সদস্যরা জ্যোৎস্না রাতে উটের পিঠে চড়ে মরুসফরে বেরিয়ে পড়েছে। ক্যাম্পের মাঝখানে একটা বিশাল ডান্স ফ্লোর। তার চারপাশে অ্যারাবিয়ান কার্পেটের ওপর বড় বড় পিলো পাতা। প্রতি চারটা মুখোমুখি পিলোর মাঝখানে একটা করে ছোট্ট কাঠের টেবিল। ওরই একটিতে গিয়ে বসলাম আমরা। আমাদের গাড়ির ব্রিটিশ দম্পতিটির আশে-পাশে শ্রীলংকান ভদ্রলোকটিকে ঘুরঘুর করতে দেখে কেমন জানি একটু মায়া হলো। ওকে কি ডাকবো আমাদের টেবিলে? না থাক। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখি ব্রিটিশদের সাথে ওর বেশ ভাব হয়ে গেছে। বেশ হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছে আর মাঝে মাঝেই উঠে গিয়ে ওদের জন্য খাবার নিয়ে আসছে।

অফুরন্ত পানীয়ের ব্যবস্থা রেখেছে আয়োজকরা। শুরুতে কিছু দেশী স্টার্টার দেওয়া হলো। ওগুলোও মাংসেরই তৈরী। একটি শুধু ভেজিটারিয়ান আইটেম ছিল, ফালাফল। এই খাবারটির সাথে আমরা আগেই পরিচিত। আবিদজানের সব লেবানীয় রেস্টুরেন্টেই পাওয়া যায়। অঢেল খাবার-দাবার আর এতোসব আয়োজন দেখে মনে হয় না দুবাইয়ের শেখরা এই ব্যবসাটি নিছক লাভের জন্য করে। সম্ভবত ওরা ওদের ট্র্যাডিশনকেই প্রমোট করছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই সমস্ত বাতি নিভে গেল। ওপরে খোলা আকাশ। আকাশে পূর্ণিমা চাঁদ। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত গহীন মরুর বুকে একদল মানব-মানবী উচ্ছাসে মেতে উঠেছে। ঝিরঝিরে শীতল হাওয়া বইছে। আমি সটান শুয়ে পড়লাম মরুর বালুর ওপর। নিচ থেকে হালকা তাপের ভাপ উঠছে। ওপরে শীতল হাওয়া আর মাথার ওপরে খোলা আকাশ। হাজারো তারার মাঝে পূর্ণ যৌবনা এক মরুচাঁদ। অপূর্ব ফিলিংস। বালুর ভাপে বুঝি ভ্রমণের ধকল আর পিঠের ব্যথা সব মিইয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ ডান্স ফ্লোরের বিশেষ বাতিগুলি জ্বলে উঠলো। চমৎকার ট্র্যাডিশনাল অ্যারাবিয়ান মিউজিক বেজে উঠলো। আর ঠিক তখনি আকাশের চাঁদ নেমে এলো মাটিত, ডান্স ফ্লোরে। ত্রিশ মিনিট ধরে চললো অপূর্ব নৃত্যকলা। মেয়েটি একে একে দলের বয়োবৃদ্ধদের হাত ধরে টেনে টেনে ফ্লোরে তুলে নাচের মুদ্রা শেখাতে শুরু করলো।

এবার ফেরার পালা। প্রায় ১ ঘন্টা ড্রাইভ করে আমরা দুবাই শহরে এসে পৌছলাম। রাতের দুবাই তার পূর্ণ যৌলুশ নিয়ে ঝকমক করে জ্বলছে। আমাদের শ্রীলংকান ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে কিছুটা কুঁজো হয়ে যখন ব্রিটিশ দম্পতিটিকে গ্রিট করলো ঠিক তখনি ওর পকেট থেকে বেরিয়ে পড়া আইডি কার্ডটি আমরা দেখতে পেলাম, ওতে ইংরেজীতে লেখা ‘বাংলাদেশ পুলিশ’।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
৩ জুলাই, ২০০৬